



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 553 - 562

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বর্ণিত যুদ্ধপদ্ধতি : একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

ড. প্রসেনজিৎ পট্টয়া

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

রামপুরহাট কলেজ

Email ID: prosenjitpatua91@gmail.com



Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Vishnudharmottara
Purana, Ramayana,
Mahabharata,
Bhagavad Gita,
Arthashastra,
encyclopedic,
Chaturanga.

Abstract

The Vishnudharmottara Purana draws upon various earlier texts—such as the Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, Bharata's Natyashastra, Yajnavalkya Samhita, and Samkhya philosophy—incorporating quotations from them. Furthermore, while it shares content with works like the Agni Purana, Matsya Purana, and Manu Samhita—sometimes through verbatim reproduction, sometimes in summarized form, and at other times through such skillful selection—determining its precise origins becomes a highly difficult task. To transform this Purana into an encyclopedic work, various narratives were employed to present detailed information on topics such as mythology, cosmogony, geography, astronomy, astrology, politics, warfare, medicine, culinary arts, perfumery, horticulture, grammar, lexicography, drama, dance, vocal and instrumental music, sculpture, painting, architecture, urban planning, ancient arts, and temple construction. Although the political perspective in the Vishnu dharmottara Purana was formulated by drawing upon the Kautilya Arthashastra and, to some extent, the later Manusmriti and Yajnavalkya Smriti, we have not yet been able to ascertain the specific military strategies and tactics employed to achieve victory in warfare during that era. The Vishnudharmottara Purana identifies warfare as a primary source of state revenue, a concept embodied in the Chaturanga (four-fold) military system. In reality, however, cavalry was not regularly deployed; the Puranas placed greater reliance on infantry. Furthermore, cavalry was prioritized over elephant-borne troops. Chariot warriors were not frequently utilized, and there was absolutely no practice of training Arab soldiers, as such training was perceived as tantamount to treachery on the part of the cavalry.

Discussion

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বিষ্ণু যে সর্বময় কর্তা তার প্রচার। তিনি হচ্ছেন এই বিশ্বজগতের প্রকাশ এবং বৈষ্ণবেরা হলেন প্রধান। ঋষি ব্যাসদেব সবসময় চেষ্টা করেছেন বিষ্ণু যে সর্বময় কর্তা সেটা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিভিন্ন দেবদেবীর চেয়ে অনেক উপরে বিষ্ণুকে দেখিয়েছেন। সেই জন্যই তার শিরোনামের যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর এই নামকরণের মাধ্যমেই তিনি বিষ্ণুধর্মের প্রাধান্য বা মহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। এছাড়া এই পুরাণের একটি অধ্যায়ে শুধুমাত্র বিষ্ণুর স্তুতি ও মহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণকে অনায়াসে ‘পৌরাণিক বিশ্বকোষ’ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই পুরাণে বহু বিষয়ের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণবধর্ম ব্যাখ্যাত এই পুরাণে আলোচিত অন্যান্য বিষয়গুলি হল প্রাচীন ভারতীয় অজস্র উপাখ্যান, সৃষ্টিতত্ত্ব, ভূগোল, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, কালবিভাগ, গৃহশান্তি, রোগশান্তি, ঔষধিতত্ত্ব, পশুপালন, কৃষিবিজ্ঞান, উদ্যানবিদ্যা, ব্যাকরণ, কোষ, রন্ধনপ্রক্রিয়া, নাট্যতত্ত্ব, নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত, ভাস্কর্য্য, প্রতিমা লক্ষণ, শিল্প, স্থাপত্য, নীতিবিজ্ঞান, চিত্রবিদ্যা, বৈষ্ণব দর্শন, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন বর্ণাশ্রমধর্ম, সমাজে নারীর স্থান ও কর্তব্য। বিষ্ণুধর্মোত্তরের ‘শংকর গীতা’ এবং ‘হংস গীতা’ যা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের ইতিহাসে দার্শনিক চিন্তা সমন্বিত এবং বিষ্ণুর মহাত্ম্য কীর্তন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত আলোচনা দৃষ্ট হয়। রাজা হল প্রশাসন বা বিচার বিভাগের প্রধান কিন্তু তার অধিকার এবং শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব বা ভূমিকা খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। দেখা গেছে ব্রাহ্মণেরা গুরুতর অপরাধ করলেও তার ক্ষেত্রে অপরাধ মার্জনা করতে হয়েছে, কিন্তু অন্যবর্ণের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে যুদ্ধকে সরকারের প্রধান আয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অশ্বরোহী সেনাদের নিয়মিত ব্যবহার হত না। পুরাণে পদাতিক সৈন্যবাহিনীর ওপর বেশী নির্ভর করা হত। এছাড়া গজারোহী সেনা অপেক্ষা অশ্বরোহী সেনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। রথি সৈন্যদের প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা হত না। আরব সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার রীতি একেবারেই ছিল না। মনে করা হত এই প্রশিক্ষণ অশ্বরোহী সৈন্যদের বিশ্বাস ঘাতকতার সামিল। গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের ব্যবহার এবং সৈন্যবাহিনীর প্রশিক্ষণের আদেশ দেওয়া হত। এই সময় জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর অর্থনৈতিক বিশ্বাস থেকে মানুষকে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। এই পুরাণে যুদ্ধের নীতিগত তত্ত্বের ব্যাখ্যা রয়েছে।

যুদ্ধ যাত্রার উপযুক্ত সময় : বছরের বিশেষ বিশেষ ঋতুতে সামরিক অভিযানের যথোপযুক্ত সময় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- শরৎ ও বসন্ত ঋতুকে উপযুক্ত সময় বলে মনে করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, মনুসংহিতা ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কথিত হয়েছে-

“পার্কিগ্রাহ্যধিকং সৈন্যং মূলে নিষ্কিপ্য বা ব্রজেৎ।

চৈত্রং বা মার্গশীর্ষং বা যাত্রাং যায়ান্নরাধিপঃ।।”^১

“মার্গশীর্ষে শুভ মাসি যায়াদ যাত্রাং মহীপতিঃ।।

ফাল্গুনং বাথ চৈত্রং বা মাসৌ প্রতি যথাবলম।।”^২

“মার্গশীর্ষং তৈষং চন্তুরেণ দীর্ঘকালং যাত্রাং যয়াৎ।।”^৩

উপরিউক্ত ঋতুগুলির উপযোগিতা তুলে ধরা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে ঐ সকল ঋতুতে ফসল তোলা হয়ে থাকে এবং জলের কষ্ট হয় না। এছাড়া বেশি ঠাণ্ডা বা গরম থাকে না। মহাভারতের শান্তি পর্বে বলা হয়েছে যে –

“অভিনীতানি শাস্ত্রাণি যোধ্যাশ্চ কুতনিশ্চয়াঃ।

চৈত্রাং বা মার্গশীর্ষাং বা সেনাযোগে প্রশস্যতে।।”^৪

কৌমুদ মাসে বা অক্টোবর নভেম্বর মাসে প্রভূত খাদ্য ও ইন্ধন সুলভ হয়। এই সময় সমস্ত গাছপালা ও ওষধি সতেজ ও শ্যামল থাকে। বৃক্ষগুলি ফলে ভর্তি থাকে, মাছির উপদ্রব এই সময় কম থাকে, রাস্তা ঘাটে কাদা থাকে না। জলবায়ুও স্বাস্থ্যোপযোগী হয়। তবে এই ঋতুগুলি ছাড়াও অন্য ঋতুতেও যুদ্ধ যাত্রা করা চলত। রাজনীতির একটি সর্বজন বিদিত নীতি হল শত্রু যখন বিপদে পড়ছে তখনই তাকে আক্রমণ করা উচিত এবং তা বছরের যেকোন সময়েই করা যেতে পারে। বিষ্ণুধর্মোত্তর-পুরাণ ও কৌটিল্য এর মতে উদ্দেশ্যের প্রকৃতি ও সৈন্যবলের সংগঠনের ওপর যুদ্ধযাত্রার সময়

নির্ভর করে। মার্গ শীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসে বিজিগীষু রাজার উদ্দেশ্য হবে শত্রুর বর্ষার ফসল এবং শরৎকালীন ‘মুষ্টি’ ধ্বংস করা। কিন্তু বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বলা হয়েছে শরৎকালীন ‘পুষ্টি’ নষ্ট করার কথা।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বছরের অন্যান্য ঋতুতেও যুদ্ধ যাত্রা করা যায়। কৌটিল্য মনে করেন সৈন্য বলের প্রকৃতিও এই বিষয়ে বিচার করা উচিত। এই প্রসঙ্গে মনু বলেছেন –

“অন্যেত্বপি তু কালেষু যদা পশ্যে দ্রুতবং জয়ম্।

তদা যায়াদ বিগৃহ্যেব ব্যাসনে চৌথিতে রিপে।।”^৫

যেমন - বিজিগীষুর সৈন্যবাহিনীতে যদি হাতির সংখ্যা বেশী হয়, তাহলে বর্ষাকালেও যুদ্ধ যাত্রা প্রশস্ত। কারণ উষ্ণ আবহাওয়াতে হাতিরা খায় বেশী এবং কুষ্ঠ রোগ হয়। এছাড়া জলাভাব ঘটলে তারা ক্ষিপ্ততা হারিয়ে ফেলে এবং দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। এই একই কারণে মরু অঞ্চলে বর্ষাকালে যুদ্ধ যাত্রাই ভাল। তবে সৈন্য-বাহিনীতে যদি রথ ও ঘোড়াই প্রধান অবলম্বন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অন্য ঋতুতেও যুদ্ধ যাত্রা করা উচিত।

চতুরঙ্গ সৈন্য : বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে চতুরঙ্গ বলের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে –

“চতুরঙ্গ বলং কুর্য্যাসুভূতং চ।”^৬

“চতুরঙ্গ বলং রাজা।”^৭

“চতুরঙ্গবলোপেতাঃ সর্ব।”^৮

“চতুরঙ্গ বলোপেতাং প্রহরঙ্কিনীর।”^৯

“চতুরঙ্গমিদং চেতি-”^{১০}

“চতুরঙ্গ লবিস্তার-”^{১১}

অভিযানের সময় প্রথমে উপস্থিত হওয়া, বলে ও দুর্গে প্রবেশ করা, ভাঙা রাস্তার সংস্কার বা নির্মাণ করা, ঘাট তৈরী করা, জলে নেমে সাঁতার দেওয়া, একাঙ্গ বিজয় অর্থাৎ শুধুমাত্র হস্তী দ্বারা বিজয় সম্পন্ন করা, অভিন্ন পার সৈন্যের ভেদ করা, ছত্রভঙ্গ সৈন্যকে আবার একত্রিত করা। বিভীষিকা বা ত্রাসের সঞ্চারণ করা, প্রাচীর ও দর্জা ভেঙ্গে দেওয়া, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়ার সময় ধন, ঐশ্বর্য বহন করা এবং ভয় থেকে সৈন্য বাহিনীকে রক্ষা করা, গজসৈন্যের ইত্যাদি কাজ ছিল বলে মনে হয়। শত্রুও চতুরঙ্গ সৈন্যের প্রতিরোধ অভেদ যোগ্য সৈন্যদের ভেদ সাধন অর্থাৎ শত্রুর ব্যূহ ভেদ, এছাড়া নিজের পক্ষের সৈন্য একত্রি ‘রথকর্ম’ বলে অভিহিত। বনপথ ও অন্যান্য চারিদিকের পথের নিক্ষেপ করা। বিবিধ ও আসারের রক্ষা করা, পলায়মান সৈন্যের পিছু অনুসরণ করা, চটজলদি বার্তা জ্ঞানাদি কার্য সম্পাদন করা, বিপন্ন সৈন্যের অনুসরণ করা বা রক্ষা করা, বিপক্ষে কোটার পার্শ্বভাগে অথবা অগ্রভাগ ও জঘনের অর্থাৎ পৃষ্ঠভাগের বধসাধন এগুলি অশ্বকর্ম বলে কথিত হয়েছে। সবসময় শস্ত্রধারণ করাই পদাতিক সৈন্যের কাজ বলে বিবেচিত হত। এছাড়া জাতি যেমন - সৈন্য মধ্যে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি, জাতির মধ্যে মদ্রমল্লাদি দেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে এমনও জাতি, অশ্বমধ্যে বাহ্লীক-কম্বোজাদি দেশ থেকে জাত, বা সত্ত্ব বা বসানে ও অভ্যুদয়ে নির্বিকার ভাব, উপযুক্ত বয়স, প্রণীতা অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাত প্রাপ্ত হয়েও যে হঠাৎ মরে না, সুদৃঢ় শরীর, বেগযুক্ত, তেজস্বী, শিল্প বা পদাতিক অস্ত্র শিক্ষায় দক্ষ আর হস্তি - অশ্বদিগের রণশিক্ষা দেওয়া, উগ্রতা বা চওড়া প্রশস্ত বুক, স্থৈর্য, সাধু বিধেয়তা বা উত্তম ব্যবহার উপযোগী, প্রশস্তি লক্ষণ এবং আচার অর্থাৎ পদাতিক সুব্যবহার ও হস্তি অশ্বাদির সুশিক্ষা এই সমস্ত লক্ষণ যুক্ত হস্তি ও অশ্ব এ পদাতিকগণকে কার্যে নিযুক্ত করবেন। এগুলিই গজ-অশ্ব রথ ও পদাতিকের কর্ম বলে বিবেচিত হত।

রণবাদ্য : রাজা ভরত যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন তখন বিপরীত সৈন্যকে ভীতির সঞ্চারণ করতে দুন্দুভি আওয়াজ করা হত। এই দুন্দুভির সঙ্গে সমার্থক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হত বৈদিক সাহিত্যে। যথা - আঘাটি, আড়ম্বড়, কর্করী, কাওবীনা, তনভ, দুন্দুভি, নারী, ভূমিদুন্দুভি, লম্বর, বাণ, বাণী ও বীনা। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে নিবদ্ধ হয়েছে –

“আহ্বানদুন্দুভিস্তত্র নিক্রান্তে ময়ি চাহতঃ।

এতজগ্জাত্বা স যুদ্ধায় প্রাতঃ সজ্জা ভবেত্তব।।”^{১২}

বুহ রচনা : বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে^{১৩} বিভিন্ন প্রকার ব্যূহের উল্লেখ করেছেন। যেমন - গরুড়, মকর, শকট, সূচী পদ্ম, মণ্ডল। যুদ্ধ আসন্ন হলে যখন শত্রু ভাবাপন্ন দুটি সৈন্যদল পরস্পরের মুখোমুখি হয় তখন ব্যূহ রচনা করা দরকার। এবিষয়ে মনুসংহিতাতেও উপরিউক্ত কয়েক রকম ব্যূহের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন - দণ্ড, শকট, বরাহ, মকর, সূচী, গরুড় ও পদ্ম। কিন্তু এইসব ব্যূহের আকৃতি সম্পর্কে মনু^{১৪} কোন আলোচনা করেননি।

কৌটিল্য^{১৫} ও উত্তর কৌটিল্য রাজনীতি শাস্ত্রকারেরা এ বিষয়ে বিশদ ও সুসংবদ্ধ আলোচনা করেছেন। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে সাধারণ ভাবে ব্যূহগুলির পাঁচটি ভাগ পরিলক্ষিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে যে দুটো অংশ থাকতো যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করত এবং অন্য আরেকটি অংশ তাদেরকে রক্ষা করত। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, ঐ এককের সংখ্যা নয় থেকে একুশ পর্যন্ত হতে পারত। এই এককগুলির মূল উপাদান ছিল একটি রণ বা একটি হাতি এর সঙ্গে থাকত পাঁচজন অশ্বারোহী সামনে পনেরো জন পেছনে পনেরোজন পদাতিক বাহিনী। এইভাবে নয়টি একক যুক্ত ব্যূহে থাকত ৪৫ টি রথ বা হাতি ২২৫ জন অশ্বারোহী, ৬৭৫ জন পদাতিক সামনে ও ৬৭৫ জন পদাতিক পিছনে।

দণ্ড ব্যূহ : এই ব্যূহে পক্ষ, কক্ষ, উরস্য সমবল রূপে নিবেশিত হয়। এই তিন অংশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অগ্রসর হয়। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে সূচীমুখ, গরুড়, মকর, সেন প্রভৃতি ব্যূহের কথা উল্লেখ করেছেন। কুল্লকের মতে সবদিক থেকে আক্রমণের ভয় থাকলে তার থেকে রক্ষার জন্য দণ্ড ব্যূহের নানা প্রকার ভেদের উল্লেখ করেছেন। যথা - প্রদণ্ড, দৃঢ়ক, অসহ্য, সেন, চাপ, চাপকুক্ষি ইত্যাদি। উশনস্ ও বৃহস্পতির মতানুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে স্থাপিত সৈন্যদল যখন বক্ররেখায় সজ্জিত হয়, তখন তা দণ্ডব্যূহ।

ভোগ ব্যূহ : বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে শকট ও মকর এই দুই ব্যূহের নাম উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে - ‘অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দ্রাকৃতি এবং চক্রাকার ব্যূহ দেখা যেত’। কৌটিল্য শকট ও মকর ব্যূহের নাম উল্লেখ করেছেন। বরাহ ব্যূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে কুল্লক ভট্ট বলেছেন -

“সূক্ষ্ম মুখপশ্চাদ ভাগঃ পৃথুমধ্যো বরাহ ব্যূহ।”

অর্থাৎ বরাহ ব্যূহের আকৃতি হবে অনেকটা রম্বসের মত, এছাড়া মকর ব্যূহের আকৃতি হবে ঠিক তার উল্টো। অর্থাৎ দুটো ত্রিভুজ তাদের শীর্ষ বিন্দুতে মিলিত হলে যেমন দেখায়।

মণ্ডল ব্যূহ : এই ব্যূহের পক্ষ, কক্ষ ও অগ্রভাগ একে অপরের এত কাছাকাছি থাকে যে তাদের কোন অবকাশ থাকে না। তিনটি অংশ যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সব অংশগুলো যুগপৎ যে কোন দিকে অগ্রসর হতে পারে। এই ব্যূহের দুটি প্রকার ভেদ হল সর্বত্রভদ্র ও দুর্জয়। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণেও সূচী, পদ্ম ও মণ্ডল ব্যূহের প্রাধান্যের কথা স্বীকার করা হয়েছে।

অসংহত ব্যূহ : ‘অসংহত’ শব্দের অর্থ শিথিল। এতে পক্ষ, কক্ষ, অগ্রভাগ পরস্পরের থেকে দূরে থাকত, এই অংশগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে এগিয়ে যেতে থাকতেন। ব্যূহ রচনার সময় এদের কোন মৌলিক অবস্থান ছিল না। এই ব্যূহের প্রকারভেদ হল - বজ্র, গোধা, উদ্যোগক, কাকপদী, অর্ধচন্দ্রিকা, ককট সিংগি। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্ধচন্দ্রাকৃতি এবং শকট ব্যূহ রচনা করা হত। এছাড়া কৌটিল্য, অরিস্ট, অচল অপ্রতিহত, চক্র, মধ্যভেদী নামে ব্যূহের কথাও উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান যুগেও স্থলবাহিনীতে সেনাবাহিনীর ফরমেশন^{১৬} ছয় প্রকার হয়ে থাকে।

১. সিঙ্গেল ফাইল ফরমেশন : এতে স্পিড এবং কন্ট্রোল বড় আকারের হয়ে থাকে যা ‘এনফিল্ড ফায়ার’ এর জন্য ঠিক নয়। লুকানো রাস্তায় অর্থাৎ ঝোপ ঝাড় এলাকায়, গর্ত এলাকায় এই ফরমেশন কাজে লাগে। এই ফরমেশন কারগর ফায়ারের জন্য ঠিক নয় অর্থাৎ লড়াই এর জন্যে উপযোগী নয়।

২. ডায়মণ্ড ফরমেশন : এতে কন্ট্রোল ঠিক থাকে। ‘এনফিল ফায়ারের’ জন্য উপযোগী নয়। সেটি সব দিকে ফায়ার করার জন্য এবং দেখার জন্য। এছাড়া শত্রুর ওপর নজর রাখার জন্য এই ফরমেশন কাজে লাগে।

৩. অ্যারোহেড ফরমেশন : দ্রুততার সঙ্গে যে কোন দিকেই শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য এই ফরমেশন কাজে লাগে। তবে সামনের দিক থেকে গুলি এলে এই ফরমেশন ঠিক নয়। খোলা মাঠ হওয়ার সময় এই ফরমেশন খুব কাজে লাগে।

৪. এক্সটেন্ডেড লাইন ফরমেশন : যা সামনের শত্রুকে চিহ্নিত করার জন্য যা নিচু জমি পার করার জন্য ব্যবহার হয়। যা হাঁটু গেড়ে সামনে যুদ্ধ করার জন্য সর্বোত্তম।

৫. ফাইল ফরমেশন : এটি ঠিক সিঙ্গেল ফাইল ফরমেশনের মতই হয়ে থাকে। এটা সামনে থাকে। এর ফলে ঠিক ভাবে কন্ট্রোল করা যায়। যখন রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া হয় তখন এই ফরমেশন ব্যবহৃত হয়।

৬. স্পীয়ার হেড ফরমেশন : এটি ফায়ার করার পক্ষে উপযোগী। এল.এম.জি গ্রুপের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং এতে সবথেকে বেশী সামনের দিকে ফায়ার করা যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে বধ্য ও অবধ্য বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার বিধি : ধর্মযুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী সমানে সমানে যুদ্ধ হবে। পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকের, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহীর, গজারোহীর সঙ্গে গজারোহীর। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে কথিত হয়েছে যে –

“সম। সমেন যোদ্ধব্যো নাপাচারো রণে দ্বিজ।।

সন্নদ্ধেন চ সন্নদ্ধঃ সাম্পশ্চগতেন তু।।

রথী চ রথিনা রাম পদাতিশ্চ পদাতিনা।।

কুজরস্থো গজছেন যোদ্ধব্যো ভূগুনন্দন।।

বিমুখো ভগ্নশস্ত্র স্ত্রীবালপরিরক্ষিতা।।

ব্যায়ুধো ভগ্নগাত্র তথৈব শরণাগতঃ।।

পরেণ যুদ্ধ্যমানশ্চ যুদ্ধপ্রেক্ষক এব চ।।

আর্তস্তোয়প্রদাতা চঃ দণ্ড পাণিস্তথৈব চ।।

এতে রণে ন হন্তব্যো ক্ষত্রধর্মভীদাতা।।”^{১৭}

মনুসংহিতাতে ন্যায় যুদ্ধের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

“ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীব ন কৃতাজ্জলিম।

ন মুক্তকেশং নাসীনং নতবাস্তীতি বাদিনম্।।”^{১৮}

“ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং নগ্নং ন নিরায়ুধম্।

নাধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেন সমাগতম্।।

নায়ুধব্যসন প্রাপ্তং নার্ত নাতিপরিক্ষতম্।

ন ভীতং ন পরাবৃত্তম সতাং ধর্মমনুস্মরণ।।”^{১৯}

উপরিউক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বলা হয়েছে যে ন্যায় যুদ্ধের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধমান সৈনিকের এই নীতি গুলি মেনে চলা উচিত। উন্মুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বা দুর্গ আক্রমণের সময় যেসব ব্যক্তিদের আক্রমণ করা চলবে না। তারা হল যে শত্রু রথ ত্যাগ করেছে, রাজা রথারূঢ় থেকে তাকে বধ করবেন না, নপুংসক, মুক্ত কেশে পলায়ন, যুদ্ধে নিবৃত্ত কিন্তু আসনে উপবিষ্ট আত্মসমর্পণকারী, যুদ্ধের ক্ষেত্র হতে নিবৃত্ত, উলঙ্গ, নিরস্ত্র, মধ্যবিমুখ দর্শক ও পরাজিত লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না, নিধনও করবেন না। মহাভারতের শান্তিপর্বে ও শূক্রনীতিসারে প্রায় একই কথা বলা হয়েছে –

“বৃদ্ধবালৌ ন হন্তব্যৌ ন চ নৈব পৃষ্ঠতঃ।

ভৃগুপূর্বমুখশ্চৈব তবাস্তীতি চ যো বদেৎ।।”^{২০}

“ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীব ন কৃতাজ্জলিম।

ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্তীতি বাদিনম্।

ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধ।

নায়ুধ্যমানং পশ্যন্তং যুধ্যমানং পরেণ চ।।

বৃদ্ধবালৌ নহন্তব্যে, নৈব স্ত্রী কেবলো নৃপঃ।।”^{২১}

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ ও মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, রাজা কূট অস্ত্র, কর্ণি আকার অস্ত্র, ফলকযুক্ত অস্ত্র, বিষলিগুঅস্ত্র ও অগ্নিমুখ শলাকা বা অস্ত্রের ব্যবহার দ্বারা শত্রুকে বিনাশ করবেন না –

“ছিদ্রাদেব পরং ছিদ্রং তস্যস্যান্নাত্র সংশয়ঃ।

ন কর্ণী ন তথা দিগ্ধঃ শরঃ স্যাদ্ধর্ময়োধিনাম্।।

নাস্তিশল্যঃ শরঃ দারুশল্যশ্চ ভার্গব।

সমঃ সমেণ যোদ্ধব্যো নাপচারো রণে দ্বিজ।।”^{২২}

“ন কুউট রায়ধৈহং ন্যাদমানো রণে রিপুম্।

ন কর্ণিভিনাপি দিক্শৈনাগি জ্বলিততেজনৈঃ।।”^{২৩}

রামায়ণে^{২৪} অস্ত্রকে চার শ্রেণীতে ভাগকরা হয়েছে - যুক্ত, আযুক্ত, যুক্তযুক্ত, মস্ত্রযুক্ত। হরিবংশে ১২ ধরনের অস্ত্রের কথা বলা হয়েছে - ১. ধনুক ২. তীর ৩. বিন্দিভাল ৪. শক্তি ৫. দ্রুঘন (Drughana) ৬. তোমার (Tomara) ৭. নালিক (Musket) ৮. লগুড় (Laguda) ৯. পাশ ১০. চক্র (Discus) ১১. দন্তকন্টক (Tooth), এবং ১২. মুসন্দি (Musandi) ইত্যাদি পাওয়া যায়। তাই অস্ত্র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

“মুদগরৈঃ কূট পাশশ্চ খুলেলুখলপর্বতৈঃ।

শত্রুস্ত্রীভিশ্চ দীপ্তাভির্দৈগৈরপি সুদারুণ।।”^{২৫}

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে রাজার বাসযোগ্য দেশ : বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে^{২৬} ও মৎস্য পুরাণে^{২৭} বলা হয়েছে যাতে কাষ্ঠ ও মাষাদি প্রচুর আছে যেখানে সামন্ত রাজাগণ বশীভূত, যেখানে বৈশ্য ও শূদ্র জাতির আধিক্য, যেখানে স্বল্প ব্রাহ্মণের বাস, যেখানে অনেক কর্মকারের বাস, যেখানে প্রজারা রাজার প্রতি অনুরক্ত যেখানে প্রচুর ফল আছে, যা শত্রু সৈন্যের অগম্য, যা রহস্য, যেখানে বাঘ ও সরীসৃপ প্রাণী নেই, যেখানে চুরি হয় না, নদীমাতৃক এবং যেখানে প্রজারা করভারে জর্জরিত নয়, সেই রকম সুখ-দুঃখ সমন্বিত যথালব্ধ দেশে রাজা নিজের সহায়ের সঙ্গে বসবাস করেন। এছাড়া বুদ্ধিমান রাজা ঐ রকম দেশে ছয় রকম দুর্গের মধ্যে যে কোন একটি দুর্গ তৈরী করতেন, দুর্গের চারিদিকে পরিখা, প্রাচীর এবং অট্টালিকা তৈরী করতেন, চারিদিকে শতদ্বীপ এবং অন্যান্য অস্ত্র বিভিন্ন দিকে প্রচুর পরিমাণে স্থাপন করতেন, রাজার পুরদ্বার হবে অতি মনোহর করাট দ্বারা সুশোভিত।

রাজা ধ্বজা যুক্ত হাতিতে চেপে ঐ মনোহর দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতেন। সেখানে চারটি আয়তবীথিকা প্রস্তুত করতেন। ঐ চারটি পথের প্রথম রাস্তার সামনে একটি দেবগৃহ তৈরী করতেন। দ্বিতীয় বীথির সামনে রাজভবন করাবেন। তৃতীয় বীথির সামনে থাকতে ধর্মধিকরণ বা কোট। এছাড়া চতুর্থ বীথির সামনে পুরদ্বার নির্মাণ করতেন।

রাজপুর আয়ত, চতুরস্র, বৃত্তাকার, মুক্তিহীন, ত্রিকোন, যবধ্ব, অর্ধচন্দ্রাকার অথবা ব্রজাকৃতি করা কর্তব্য। এর মধ্যে নদী তীরস্থ অর্ধচন্দ্রাকার, রাজার বাসযোগ্য স্থান বা পুরী বসবাসের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী রাজভবনের দক্ষিণ দিকে কোন গৃহ এবং তার দক্ষিণে হাতিশালা নির্মাণ করা আবশ্যিক। হাতিশালার মুখ হবে পূর্বমুখী আবার উত্তরমুখী অগ্নিকোণে আয়ুধাগার, রান্নাঘর এবং কর্মশালা তৈরী করতেন। রাজভবনের বামভাগে মন্ত্রী, চিকিৎসকের, পুরোহিতের বাসগৃহ নির্মাণ করা কর্তব্য। এর বামদিকে কোষ্ঠাগার থাকত। এছাড়া গোশালা ও অশ্বশালা ও বামদিকে রাখা দরকার, অশ্বশালার মুখ হত উত্তর বা দক্ষিণ দিকে, অন্যদিকে মুখ হওয়া ভাল নয় বলা হয়েছে। অশ্বশালায় সারা রাত্রি প্রদীপ জ্বলতো। অশ্বগণ তাতে বাস করত, অশ্ব হিতৈষী রাজা অশ্বশালায় কুকুর, বানর, মরকট, ছাগল এবং বাছুর সমেত রাখতেন। সূর্য অস্ত গেছে ঘোড়া, হাতি এবং গোশালা থেকে মলমূত্রাদি বাইরে ফেলা হত। রাজা সারথীদেরও ঐ জায়গায় বাসস্থান প্রদান করতেন। যোদ্ধা, শিল্পী, কালজ্ঞ এবং মন্ত্রীদেরও তিনি উত্তম বাসস্থান দিতেন এছাড়া রোগ দূর করার জন্য গো বৈদ্য, অশ্ব বৈদ্য ও গজবৈদ্য ঐ দুর্গ মধ্যে রাখতেন। দুর্গে ব্রাহ্মণ ও চারণগণের বাসস্থান থাকতেন। কোন কারণ ছাড়া দুর্গ মধ্যে বহুলোক প্রবেশ করতেন না। সহস্র বীর মতী, নানা অস্ত্রধারী বীরগণ দুর্গ রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। দুর্গের মধ্যে কয়েকটি গুপ্ত দ্বারও থাকা

আবশ্যক। দুর্গের মধ্যে ধনু, বাণ, ক্ষেপণীয়, তোমর, খড়্গ, লণ্ডু, গুড়, হুড়, প্রস্তর, মুদগর, ত্রিশূল, পাদ্রিশ, কুঠার, প্রাস, শূল, শক্তি পরশু, চক্র প্রভৃতি অস্ত্র থাকতো।

অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে যাতে শস্য আছে, আকর আছে, প্রচুর জল আছে, খনি দ্রব্য আছে, বিবিধ পুণ্য জনপদ আছে, জলপথ ও স্থলপথ আছে, যা দোষহীন, গোপণের উপকারী তাদের মার্ভক, রমনীয় ও কুঞ্জর বল বিশিষ্ট এইরূপে ভূমি রাজার পক্ষে প্রশস্ত ও ভূরি পরিমাণে ভূতিজনক যাতে শূদ্র, শিল্পি, বণিক ও কৃষিবল আছে, বিজ্ঞান আছে এই রকম জনপদই প্রশস্ত। যার সীমা অতি বিস্তৃত, খাত অতি বৃহৎ, প্রাচীর ও তোরণ অতি উচ্চ এবং যা সরিৎ, শৈল্য মরু, অথবা বনাকৃত সেই রকম স্থানই রাজার বাসযোগ্য দেশ। আবার এই প্রসঙ্গে শুক্রনীতিতে বলা হয়েছে –

“অভেদ্যং ব্যুহবক্ষীরাণ্ডং তৎ সৈন্যদুর্গমম্।।

সহায়তুর্গেতজ্জ্যেয়ং শূরাণকুলবাংধবম্।

পারিখাদৈরিনং শ্রেষ্ঠং পারিখংভূততোবনম্।।

ততোধ্বং জলং তস্থাম্পিরিদুর্গেততঃস্মৃতম্।

সহায়সৈন্যদুর্গেতুসর্বদুর্গপ্রসাধিকে।।”^{২৮}

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে দেশের অর্থনীতিতে বার্তা অর্থাৎ কৃষি, গোপালন, শিল্প এবং বাণিজ্য ছিল অপরিহার্য। কৃষির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত জল, এছাড়া কৃষিজ পণ্যের বিপণনের জন্য জলপথ ও স্থলপথের সঙ্গে সংযুক্ত বিবিধ জনপদের প্রয়োজন আছে। এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিতে পশু সম্পদ একটি প্রধান উপাদান ছিল। রাজধানীর মধ্যে শূদ্র, শিল্পি, বিবিধ কর্মে নিপুণ দেশবাসীর প্রচেষ্টায় সেই সময় অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করেছিল।

দুর্গ : বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের ‘দুর্গসম্পত্তিনাম’ নামক ষড়বিংশতিতম অধ্যায়ে রাজা রাজধানী স্থাপনের স্থান নির্দেশ করে রাজার প্রধান অবলম্বন বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রধান অবলম্বন দুর্গ সম্পর্কে বক্ষ্যমানানুরূপ আলোচনা নিবদ্ধ আছে। দুর্গ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় গত অর্থ হল যেখানে দুঃখের সঙ্গে যাওয়া যায় তাই দুর্গ। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বলা হয়েছে – “সম দুঃখ - সুখংরাজ্যং শততং চ প্রিয়েস্থিতম্। সরীসৃপবিহীনং চ ব্যাধি তস্কর বর্জিতম্।।” নীতিবাক্য্যমুতে দুর্গসমুদ্দেশঃ নামক বিংশতি অধ্যায়ে দুর্গের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – “যস্য্যভিযোগাৎপরে দুঃখং গচ্ছ্যন্তি দৃষ্টনোদ্যোগ বিষয়া স্বস্যাপাদো গময়তীতি দুর্গ” - এর টীকায় বলা হয়েছে – “যস্য দুর্গস্য্যভিযোগাৎ প্রাপ্তোঃ পরে শত্রবো দুঃখং যান্তি তথা দুর্জনাশেষনায়ং যন্তু গ্রহনর্থং, যোহসাবুদ্যমঃ তস্য বিষয় গোচরং যস্কু লক্ষণে প্রবিশতি।।”

শুক্রনীতিসারে বলা হয়েছে পারিখ দুর্গ থেকে ত্রিবিণ এবং ঐ ত্রিবিণ থেকে পারিখ এবং পারিখ থেকে রণদুর্গ শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত। এর থেকে ধনুদুর্গ এবং সৈন্যদুর্গ থেকে গিরিদুর্গ শ্রেষ্ঠ, সহায়দুর্গ এবং সৈন্যদুর্গ সব দুর্গের সাধন হয়। আর অন্ন, শূরবীর, অস্ত্র, কোষ ইত্যাদিতে যে দুর্গ পুষ্ট ঐ দুর্গকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ দুর্গ বলা হয়েছে।

দুর্গের গঠন বৈশিষ্ট্য ও স্থান নির্ণয়ের মধ্যেও উক্ত নাম করণের তাৎপর্য নিহিত আছে। রাজার ৭২ প্রকার প্রকৃতির মধ্যে দুর্গ অন্যতম। তাই রাজা ও রাজ্যেও সুরক্ষার ব্যাপারে দুর্গের গুরুত্ব অপরিসীম। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ^{২৯}, মনুসংহিতা^{৩০}, মৎস্য পুরাণ^{৩১}, অগ্নিপুরাণে^{৩২} ও কামন্দকীয় নীতিসারে^{৩৩} দুর্গের প্রকৃতি গত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ৬ প্রকার দুর্গের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চার প্রকার দুর্গের উল্লেখ করে প্রত্যেকটি আবার দুটি করে ভেদের কথা বলা হয়েছে। যথা - ধনুদুর্গ, মহীদুর্গ, নরদুর্গ বা নৃদুর্গ, বাক্ষ্যদুর্গ, অশ্ব বা জলদুর্গ এবং গিরিদুর্গ।

১. ধনুদুর্গ : এই ষড়বিধ দুর্গের মধ্যে যে কোন একটি দুর্গকে আশ্রয় করে রাজা তার রাজধানী নির্মাণ করতেন। ধর্মশাস্ত্রকার মনু ঐ দুর্গ সমূহের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ না করলেও টীকাকার কুল্লুক এই সমস্ত দুর্গের লক্ষণ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তার মতে পঞ্চযোজন মত মরু প্রদেশ বেষ্টিত এবং স্বল্প জলমুক্ত দুর্গই হল- ধনুদুর্গ। “ধনুদুর্গ মরু বেষ্টিতং চতুর্দিশং পঞ্চযোজনম্ অন্তরুদকম্।।” প্রকৃত পক্ষে এই দুর্গ হল মরুদুর্গ। চতুর্দিকে মরুবেষ্টিত বলে বাইরে জলাভাব

থাকলেও দুর্গেও অভ্যন্তরে উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা থাকবে। শত্রুর পক্ষে মরুপ্রদেশ অতিক্রম করে দুর্গ অধিকার করা এক্ষেত্রে খুবই সুসাহ্য।

২. মহীদুর্গ : মহীদুর্গ হত, পাষান বা ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাচীরের উচ্চতা হবে ১২ হাত পরিমিত। প্রাকারের উপরিভাগে সৈন্যদের পরিভ্রমণের জন্য প্রশস্ত স্থান থাকত এবং প্রাকারটি হত অনেক গবাক্ষযুক্ত। যেমন চীনের প্রাচীরের উপর দিয়ে চারজন অশ্বরোহী সেনা চলাচল করত এবং তার উচ্চতা ২৪ ফুট, দীর্ঘ ১৫০০ কিলোমিটার।

৩. জলদুর্গ : চতুর্দুর্গ জল দ্বারা বেষ্টিত দুর্গকে বলা হয় অবদুর্গ বা জলদুর্গ। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বলা হয়েছে “জলদুর্গং অগাধোদকেন সর্বতঃ পরিবৃত্তম্” অর্থাৎ জলদুর্গ হবে গভীর জলপূর্ণ পরীখা দ্বারা বেষ্টিত।

৪. বাক্ষ্যদুর্গ : এই দুর্গ হত বৃক্ষ গুল্মাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর চতুর্দিকে যেমন - পরিমিত স্থান বিভিন্ন বৃক্ষ এবং কাঁটায়ুক্ত গুল্ম দ্বারা ও লতা দ্বারা পরিবৃত্ত থাকত। এই বিষয়ে কুল্লকের মত প্রণিধানযোগ্য - ‘বাক্ষ্যদুর্গং বহিঃ সর্বতো যোজন মাত্রং ব্যাপ্য তিষ্ঠন্ মহাবৃক্ষ কণ্টকি গুল্ললতদ্ব্যচিৎ’। এই দুর্গকে কামন্দকীয় নীতিসারে বনদুর্গ নামে অবহিত করা হয়েছে।

৫. নরদুর্গ বা নৃদুর্গ : চতুর্দিকে সৈন্য সমাবেশের দ্বারা রচিত দুর্গের নাম ‘নৃদুর্গ’। নৃদুর্গ হবে সুরক্ষিত। বহু সংখ্যক হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিক সৈন্য চতুর্দিকে এই দুর্গের সুরক্ষায় নিযুক্ত থাকত। তাই টীকাকার কুল্লক বলেছেন - “নৃদুর্গং চতুর্দিগবস্থায় হস্ত্যশ্বরথযুক্তং বহুপাতাত রক্ষিতম।”

৬. গিরিদুর্গ : বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ^{৪৪}, অগ্নিপু্রাণ^{৪৫}, মনুসংহিতায়^{৪৬}, কামন্দকীয়নীতিসার^{৪৭} গিরিদুর্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে গিরিদুর্গ হত পর্বত পৃষ্ঠে অবস্থিত এই দুরারোহ দুর্গে প্রবেশের পথ হবে সংকীর্ণ। দুর্গের অভ্যন্তরে থাকত শম্মোৎপাদক ক্ষেত্র এবং প্রভুত বৃক্ষরাজি। এই ৬ প্রকার দুর্গের মধ্যে যে কোন একটিকে আশ্রয় করে রাজা তার রাজধানী নির্মান করতেন। উপরিউক্ত ৬ প্রকার দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ শত্রুর দুরধিগম্য, পর্বত পৃষ্ঠে অবস্থিত। এই কারণে কার্গিল যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সৈন্যদের হাতে ভারতের অনেক সৈন্য মারা গিয়েছিল। এই দুর্গের পথ হবে সংকীর্ণ ফলে বহিঃশত্রুর প্রবেশের আশঙ্কা এখানে কম। বহিঃশত্রু এখানে প্রবেশের উপক্রম করলেও অল্প প্রয়াসে অধিক শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব। তাই রাজার পক্ষে এই সুরক্ষিত বহুগুণা যুক্ত। গিরিদুর্গ আশ্রয় করাই শ্রেয়। এই দুর্গগুলির মধ্যে ধন্য দুর্গে মৃগাদি প্রাণী, মহীদুর্গে মূষিকাদি এবং জলদুর্গে কুম্ভিরাদি জলজন্তুদের আশ্রয়ের স্থল। অন্যান্য দুর্গগুলিতে যেমন বৃক্ষ দুর্গ, নরদুর্গ এবং গিরিদুর্গ যথাক্রমে বানর, মনুষ্য এবং দেবগণ আশ্রয় করেন। দেবতাদের নিবাস ভূমি বলেই গিরিদুর্গ অন্যান্য দুর্গ অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ।

শুক্রনীতিসারে দুর্গকে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে -

“অত্রানুজ্ঞাণাদোষোন্তেজোয়া লোকশাস্ত্রতঃ।

ষষ্ঠদুর্গপ্রকরণং প্রবক্ষ্যামিসমাসতঃ।।

খাতকংটকপাষানৈদুস্পথংদুর্গমৈরিণম্।

পরিতত্ত্বমহাখাতং পারিখংদুর্গমেবতৎ।।

ইষ্টকোপলমৃভিত্তিপ্রাকারংপারিঘংস্মৃতম্।

মহাং কটক বৃক্ষোমৈব্যাপ্তংতদ্বনদুর্গমম্।।

জলাভাবস্ত পরিতোধদুর্গংপ্রকীর্তিতম্।

জলদুর্গস্যতংতজৈত্তেরাসমংতান্নহাজলম্।।

সুবারি পৃষ্ঠোচ্চধরং বিবিভেগিরিদুর্গমম্।”^{৪৮}

পরীখা, কাঁটা, পাথর, গুপ্তপথ এবং এবড়ো খেবড়ো ভূমি যার সামনে আছে ঐ দুর্গকে ঐরিণ দুর্গ বলা। যার চার পাশে বড় গর্ত খোঁড়া আছে ঐ দুর্গকে পারিখ দুর্গ বলা হত। ইষ্ট, পাথর, মাটি ইত্যাদি সহকারে যে দুর্গ তৈরী করা হয় তাকে পারিখ দুর্গ বলা হত। কাঁটাবৃক্ষ সমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত দুর্গকে মরুদুর্গ বলা হত। যার চারপাশে জ্বরে অভাব আছে তাকে ধন্যদুর্গ

বলা হত। এছাড়া যার চারপাশে অনেক জল আছে তাকে শাস্ত্র ‘জলদুর্গ’ বলে আখ্যা দেওয়া হত। যা জলের উপর নিরিবিলিতে উঁচু করে তৈরী হত তাকে ‘গিরিদুর্গ’ বলা হত। যেখানে বহু সুরবীর থাকতো এবং যা ভেদের অযোগ্য এই প্রকার দুর্গকে ‘সৈন্যদুর্গ’ বলা হত। যেখানে গুরবীরের অনুকূল আত্মীয় স্বজন থাকত ঐ দুর্গকে ‘সহায়দুর্গ’ বলা হত।

Reference:

১. বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ - ২/১৬৩/৪, পৃ. ২৮৮
২. মনুসংহিতা - ৭/১৮২, পৃ. ৮২
৩. অর্থশাস্ত্র - ৯/১/১০, পৃ. ৪১৭
৪. মহাভারত, শান্তিপর্ব - ১০০/১১, পৃ. ১৭১
৫. মনুসংহিতা - ৭/১৮৩, পৃ. ৮২
৬. বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ - ৩/৩২৩/১৩, পৃ. ৪৪৫
৭. তদেব - ২/১৪৯/১
৮. তদেব - ২/১৫৯/৪৪
৯. তদেব - ৩/৪২/৬৬
১০. তদেব - ৩/৫/৪
১১. তদেব - ২/৭৭/১৫
১২. তদেব - ১/২০৯/১৭, পৃ. ১৩২
১৩. তদেব - ২/১৭৭/৭২-৭৭
১৪. মনুসংহিতা - ৭/৯০
১৫. অর্থশাস্ত্র - ৩/৪/৫২
১৬. অফসর প্রশিক্ষণ অকাদমী - প্রেসী- কর্ণেল অশোককুমার
১৭. বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ - ২/১৭৭/৭২-৭৬
১৮. মনুসংহিতা - ৭/৯১, পৃ. ৪৩
১৯. তদেব - ৭/৯২-৯৩, পৃ. ৪৩
২০. মহাভারত, শান্তিপর্ব - ৯৯/৪৮
২১. শুক্র নীতি - ৪/৭/৩৫৫-৫৬
২২. বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ - ২/১৭৭/৭১-৭২, পৃ. ৩০২
২৩. মনুসংহিতা-৭/৯০, পৃ. ৪২
২৪. রামায়ণ ২/৪/৪৮
২৫. হরিবংশ-২/২৭
২৬. বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ - ২/২৬/১-৮৮, পৃ. ১৮৮-১৮৯।
২৭. মৎস্য পুরাণ - ২১৭/১-৮৭, পৃ. ৪৬০
২৮. শুক্রনীতি - ৪/১৫৪, পৃ. ৪৯-৫৫
২৯. বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ - ২/৬৬, পৃ. ৬-৭
৩০. মনুসংহিতা - ৭/৭০/৭, পৃ. ৩৪
৩১. মৎস্য পুরাণ - ২১৭/৬, পৃ. ৭৮০
৩২. অগ্নিপু্রাণ - ২৩৯/২৯, পৃ. ৪৬০
৩৩. কামন্দকীয় নীতিসার ২০/০১, পৃ. ১৯৯

৩৪. বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ - ২/২৬, পৃ. ৭
৩৫. অগ্নিপুরাণ ২২২/৫, পৃ. ৪২৪
৩৬. মনুসংহিতায় ৭/৭১, পৃ. ৩৪
৩৭. কামন্দকীয় নীতিসার ৪/৭/৫৭-৫৮, পৃ. ১৬
৩৮. শুক্ল নীতি - ৪/১৫৪, পৃ. ৪৯-৫৩